এসো হে

বর্ষার রং

আলতা পায়ের সীমানা

হিরণ মিত্র
hiran1945mitra@gmail.com

আমার জন্ম এই জুলাই মাসে। ঘন বর্ষার মধ্যেই হয়তো। দেশের বাড়ির ছাদ ছিল টিনের। যারা টিনের বাড়িতে থেকেছে তারা জানে বর্ষা-সংগীত কাকে বলে। ঝমঝমে বৃষ্টি পড়ছে, কখনও ঝোড়ো হাওয়া, ছাঁটগুলো এলোমেলো, সংগীতও এলোমেলো। কমে এল জল পড়া, অমনি সংগীতও অন্য লয়ে চলে গেল। টাপুর-টুপুর টিনের চালে মৃদুমন্দ বাহারি শব্দ। গান, সংগীত ও শব্দ নিয়ে এত কথা চলে এল, কারণ, সংগীত বা ধ্বনি থেকে দৃশ্য জন্মায়। রং জন্মায়। ধ্বনিই তার মাতা, ধ্বনির জঠর থেকে প্রকাশিত সাত রং। সাত সুর।

বর্ষার ধুয়ে যাওয়া আকাশে দেখা যেত রামধনু। রামের ধনুক। বিশাল অর্ধগোল হয়ে ঝকঝকে আকাশে হাসছে। সে এক অফুরন্ত হাসি, সাতরং, রংচক্র আমাদের চিনিয়ে দেয় তার পরিপূরক। লাল, সবুজ, নীল, কমলা, বেগুনি, হলুদ। বর্ষার পর গাছের পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজে উল্লাসে মেতে উঠত।

পড়াও এমনই এক বর্ষায়। সব রঙে ভরা। শিল্প বিদ্যালয় ছিল রঙের কারবারিদের আখড়া। সেই রং আবার মিশ্র রং। উজ্জ্বল রংগুলোকে স্তিমিত করতে হত। আসলে রঙের উপর মেঘের ছায়া পড়ত। একটা ধূসর আস্তরণ। উজ্জ্বল লাল হয়ে যেত খয়েরি, নীল হয়ে যেত কালচে নীল, হলুদ হয়ে যেত মেটে হলুদ। বর্ষার রং হয়তো একেই বলে!

যেমন বর্ষার পর রং উজ্জ্বল হয়; তেমনই বর্ষা আসার আগে, যখন আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, দিনের আলো, ঝকঝকে হলুদ রোদ, ছায়ায় ঢেকে যায়; আমাদের মনের উপর, প্রেমের উপরও ছায়া নেমে আসে। বিষণ্ণতার ছায়া। প্রেমিকা মুখটা একটু নামিয়ে নেয়। সে কি লজ্জায়? অভিমানে? অথবা প্রত্যাখ্যানে? তারপর তো ঘন বর্ষা নামবে। আমরা ভিজে উঠব। প্রেমের জোয়ারে কত কিছু ঘটে যাবে। গড়ের মাঠের মাথা-তোলা সবুজ ঘাসগুলো আমাদের সঙ্গ দেবে। গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে অঝোরে জল ঝরবে। সবুজ জল। তোমার নীল পাড়ের শাড়ি, হলুদরঙা

শিল্পী হিরণ মিত্র

ঝলমলে। স্নান করে উঠেছে বিশ্ব চরাচর। মা যখন এমন স্নান করে বেরত, লালপাড় শাড়ি জড়িয়ে, মায়ের লম্বা কালো চুল থেকে টপটপ জল পড়ছে, ভেজা তখন, দেখতাম, একটা চুলের ফাঁস দেওয়া শেষপ্রান্তে। বুঝতাম না কেন। ঘন লম্বা চুলে যেন নজর না লাগে।

আবার এই ঘন চুল মনে করাত ঘন কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে এসেছে আকাশজুড়ে। সেই ধূসর নীলচে ঘন মেঘের ছায়ায়, সামনে ঝুলে আছে লাল রঙের টুকটুকে লঙ্কা, আবার মায়ের শাড়ির পাড়। সমস্তটাই যেন মূর্তিমতী মা, আমার সামনে মুচকি হাসছে। আবার এরপরেই মা বসত আলতার বাটি নিয়ে পরিপাটি করে পায়ে আলতার সীমানা আঁকতে। আবার লাল। এমনভাবেই বর্ষার রং হয়ে যেত, কখনও ঘন নীল ধূসর, সবুজ বনাঞ্চল, লাল সীমানারেখা।

খোয়াইয়ের লালমাটি ঠিক আলতা-রঙা পায়ের মতো চলন আনত আমার মনে। বর্ষা এতটাই রঙিন। বসন্তের রঙের সঙ্গে বর্ষার রঙের এখানেই তফাত— বর্ষা বিষণ্ণ করে, আর্দ্র করে দেয় চারপাশ, তাতে ছিটেফোঁটা রং আরও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কম কথায় রোমাঞ্চ আনে। বসন্ত যেখানে বেশি কথা, বেশি রঙের বাহারে কোলাহল করে; বর্ষা সেখানে ফিসফিস করে, কখনও মোলায়েম মিড়ের কাজের মতো, মনছোঁয়া, অন্যমনস্কতা। আমার অন্যমনস্ক হতে এত ভাল লাগে! মনস্কতা যেন নিশ্চিন্তি। এ অনিশ্চিত। বর্ষা তাই অনিশ্চিত। কখন মেঘ করবে, কখন ঘন বর্ষা নামবে, কখন রঙের বন্যা বইবে, কিছুই জানা নেই!

এই 'নেই-নেই'-এর সাম্রাজ্য বড্ড গোপন রঙিন। রঙের গোপনীয়তা গোপন প্রেমের মতো বড় রোমান্টিক। প্রথম শিল্প বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা বর্ষায়, প্রথম প্রেমে ভিজে চুপসে গায়ের সঙ্গে লেপটে যাবে। আহা! তোমাকে এত সুন্দর লাগছিল তখন! বিশাল সবুজ প্রান্তরে ওই ভেজা হলুদ গলে গলে যাচ্ছে। হলুদে, সবুজে, নীলে, ধূসরে যদিও ছেড়ে যাওয়ার বিদায়-সুর বেজে যাচ্ছে একঘেয়ে; তবুও, তবুও সেই মুহূর্ত, সেই বর্ষা, সেই রং, সব, সবই চিরস্থায়ী হয়ে যায়। জল ছপছপে, হালকা সবুজ, পায়ে পায়ে উঠে আসে। তুমি দেখতে পাও না। কারণ তুমি তখন চলে গিয়েছ!

সে আর ফিরে আসেনি। বর্ষায় বৃষ্টি-ভেজা, ঘাস, গাছ, পাতা, শুকনো ডাল, সবকিছুর সঙ্গে মিলেমিশে, একাকার হয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল! হয়তো কাদামাটির মতো গলে প্রান্তরে বিছিয়ে গিয়েছ। আমি আর তাকে খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও মনে হত, সকালের হলুদ আলোটা তেরচা করে তার মুখে পড়েছে। গলার সরু সোনার হারটা চিকচিকিয়ে উঠে হাসছে। তারপরেই মনে হল ভ্রান্তি, আমারই বানানো প্রতিমা, বিসর্জনের, শেষ ঢাকের বোলে, কেঁদে উঠছে। ভেসে যাবে, মিশে যাবে, জলের কালো স্রোতে।

তাই বর্ষার রংকে ঠিকমতো চিনে ওঠা হল না। কখনও সবুজ হতে হতেও ঘন কালচে সবুজে পাতার আশ্রয় বানাল। আমি সিঁধিয়ে গেলাম সেই আশ্রয়ে। পাতার ফাঁক থেকে আবিষ্কার করলাম আশ্চর্য নীল। বর্ষার পরের সেই নীলকে। স্নান করে ওঠা নীল পইঠা, উঠোন, ছায়া ধরা উঠোন। ভেজা উঠোনে যেমন নীলের ছায়া পড়ল, তেমনই হঠাৎই মেতে উঠল গোলাপি আভায়। কোথা থেকে জেগে উঠল এমন গোলাপি প্রেম? উত্তর পাই না! আর প্রশ্ন করি না। আশঙ্কা, প্রশ্ন করলেই সেই গোলাপি ডানাওয়ালা প্রজাপতিটা যদি উড়ে যায়! অনন্তে। নীল দিগন্তে।

তাই চুপ করে যাই।

আর্দ্র হাতছানি

৫-এর পাতার পর

পড়ছে, বাদকুল্লা। নেমে পড়লাম। সামনেই রোহিণী!

—এখানে থাকো বুঝি?

—না।

—তাহলে?

—একা হওয়ার জায়গা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে! কিন্তু রোহিণীর সঙ্গে না এগিয়েও থাকতে পারলাম না।

আজ দু'জনেরই ছাতা। তবু রোহিণী চলে এল আমার ছাতার তলায়। যাকে বলে হাপুস ভেজা, তেমন ভিজতে ভিজতে পৌঁছলাম রোহিণীর একলা ঘরে।

লাল সিমেন্টের মেঝেতে কালো বর্ডার দেওয়া ছোট্ট ঘর। একচিলতে খাট।

কালো বেডকভারে লালফুল।

তুমুল বৃষ্টি। মেঘের ডাক। কী শান্ত মসৃণ রোহিণী!

কী কুণ্ঠাহীন!

ভিজে গা থেকে একে একে ছড়িয়ে দিচ্ছে শাড়ি। ব্লাউজ। ব্রা।

লাল সিমেন্টের মেঝেতে কবিতার পাপড়ির মতো ঝরে পড়ে আছে ওরা।

রোহিণীর ভেজা পা।

বৃষ্টির জলে ধোয়া শ্যামল পা দু'টিতে আয়নার মতো গোড়ালি!

বর্ষার খাবার

ঝালঝাল, গরগরে, কষাকষা

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
rajatendra@gmail.com

বর্ষাকালে বাইরেটা যেহেতু জলজলে, ভ্যাপসা আর প্যাচপেচে, তাই আমাদের ভিতরটা সবসময় ঝালঝাল, গরগরে, কষাকষা, মুখ ছেড়ে যাবে— এমন খাওয়াদাওয়া করতে চায়। বর্ষার খাওয়া মানে ঝালঝাল চানাচুর দিয়ে মুড়িমাখা আর তার সঙ্গে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা লিকার চা। বর্ষাকাল মানে ভুট্টাকে ফুটফাট করে পুড়িয়ে তার উপর পাতিলেবুর রস, বিটনুন আর কাঁচালঙ্কা ঘষা। তারপর, কচরমচর কচরমচর।

বর্ষার বিকেলে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে ঘুগনিওয়ালার বেতের ডমরু স্ট্যান্ডের উপর সেট করা বিরাট মাপের অ্যালুমিনিয়ামের কাঁসিতে সাজিয়ে রাখা চাপচাপ ঘুগনি। যেটাকে শালপাতার ঠোঙায় নিয়ে, তার উপর পেঁয়াজ-লঙ্কা-ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে, ছোট্ট কাঠের চামচে করে মুখে পোরার যে আনন্দ, তা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? বর্ষার বিকেলের আরেক ঐশ্বর্য হল বাঙালির তেলেভাজা। বেগুনি, ফুলুরি, আলুরি, আলুচপ, ধনেপাতার বড়া, ডালবড়া— আহা! কোনটা ফেলে কোনটার কথা বলি বলুন দেখি! আর, যে কোনও পাড়ার ফাংশনে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন একই তবলচি সব্বার সঙ্গে সঙ্গত করে যায়— এদের বেলায় সেই জায়গাটা নেয় মুচমুচে সাদা, ফুরফুরে মুড়ি।

আষাঢ়-শ্রাবণে বাজারে গেলে, একফালি বর্ষার ওল কিনে এনে, ভালভাবে সেদ্ধ করে, কাসুন্দি, কাঁচালঙ্কা আর একপলা ঘানির সরষের তেল দিয়ে চটকে মেখে একথালা ভাত ভ্যানিশ করে দেওয়া যায়। আবার একে ডুমো ডুমো করে কেটে, ডুমো আলুর টুকরো সহযোগে ঘি-গরম মশলা দিয়ে বানানো ওলের ডালনা, রাতে খাওয়ার পাতে গরম হাতরুটির সঙ্গেও অপূর্ব! এ সময় বাজারে আবার হালকা খয়েরি ছোপওয়ালা মাটিমাখা গাঁটিকচু ওঠে, যা, চাপড়া চিংড়ি দিয়ে কড়াইতে হালকা নাড়াচাড়া করলেই একটু ল্যালল্যালে হয়ে যায়। তার গা থেকে বেরিয়ে আসা স্বাদের পরত! ভাতকে ছুঁয়ে, আমাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। এই বর্ষাতেই ওঠে কালচে খয়েরি গায়ের কুৎসিত মেটে আলু। কিন্তু তার সঙ্গেও ছোট মাছ তো বটেই; শোল, বোয়াল, কাতলা বা রুইয়ের মতো পাকা মাছের পেটও ডিমে ভর্তি হয়। মাছের পেটে ডিম থাকলে মাছের স্বাদ কমে যায়— এটা যেমন সত্যি, তেমনি ডিমভর্তি পারশে বা ট্যাংরার ঝালের স্বাদ যে বেশ অন্যরকম হয়— এটাও তেমনই সত্যি। রুই-কাতলার ডিম ভেজে বড়া বা ঝাল করে খাওয়ার মজাও কিন্তু এই বর্ষাতেই।

এহেন বর্ষাতেই কিন্তু ইলিশের রমরমা। সাতশো সাড়ে-সাতশোর চেয়ে বেশি ওজনের গঙ্গার ইলিশ এখন আর চট করে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু স্বাদে সে এখনও ওপার বাংলার কিলোটাক ইলিশের সঙ্গে হাসতে হাসতে পাল্লা দিতে পারে। ইলিশের ভাজা, ঝাল, ঝোল, ভাপা— যা-ই খাই না কেন তা অপূর্ব! ইলিশের ডিমভাজার মতো স্বর্গীয় স্বাদ অন্য কোনও মাছের ডিমে নেই। ইলিশমাছের লম্বাটে ডিমভাজা আঙুলের চাপে চেপটে ভেঙে, সামান্য নুন দিয়ে গরম ভাতে মেখে খেলে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'-র মতো একখানা উপন্যাস লেখার কথা মনে মনে চিন্তা করা যায়। লিখতে পারলাম, কি পারলাম না— সেটা যদিও গৌণ ব্যাপার।

রবিশংকরের সঙ্গে যেমন আলি আকবর, কিশোরকুমারের সঙ্গে যেমন মধুবালা— তেমনি ইলিশভাজার সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ি— একথা নিশ্চয়ই সবাই জানেন। খিচুড়ি হল বর্ষার আইকন। জঙ্গলপ্রেমী ও খাদ্যরসিক বুদ্ধদেব গুহর কোনও একটি লেখায়, বর্ষাদিনে কীভাবে খিচুড়ি খেতে হবে, তার নিয়মাবলি পড়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, একটি একতলা বাড়ির সামনের মাথা-ঢাকা দাওয়ায় এমনভাবে আসন-পিঁড়ি হয়ে খেতে বসতে হবে, যাতে পিঠটা দাওয়ার বাইরের খোলা উঠোনের দিকে থাকে। এতে করে যিনি খেতে বসেছেন তাঁর পিঠে বৃষ্টির কিছু গুঁড়োগুঁড়ো রেণু এসে লাগবে, কিন্তু তিনি বেশি ভিজে যাবেন না। সামনের পিঁড়ের উপর রাখা থাকবে গোল শালপাতা এবং তার উপর গরম খিচুড়ি। বেগুন বা পটল ভাজতে হবে লম্বালম্বি চিরে। অবশ্যই থাকবে কলাইয়ের ডালের ছোট বড়িভাজা। আর সামনে একটি কালো রঙের ছোট গোল কাঠের কেটকোতে ফালি ফালি করে কেটে রাখা থাকবে গন্ধরাজ লেবু। কেউ খাবে না সেগুলো— শুধু তাদের সুঘ্রাণ ভেসে বেড়াবে ভেজা বাতাসে।

রবিশংকরের সঙ্গে যেমন আলি আকবর, কিশোরকুমারের সঙ্গে যেমন মধুবালা— তেমনই ইলিশভাজার সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুড়ি— একথা নিশ্চয়ই সবাই জানেন। খিচুড়ি হল বর্ষার আইকন। আর ইলিশের ভাজা, ঝাল, ঝোল, ভাপা— যা-ই খাই না কেন তা অপূর্ব!

চিংড়ির মেলবন্ধন যে কী অসামান্য, বলে বোঝানো যাবে না!

পান্থপাদপ গাছের মিনি সংস্করণ যে কচুশাক, তা ঘি, গরমমশলা দিয়ে নেড়ে, ছোট ছোট পোস্ত-বড়ি কিংবা ইলিশের মাথা দিয়ে না খেলে তো জীবন বৃথা! এই বর্ষাতেই তো কচুর লতি ওঠে। যাকে ছোট ছোট পিসে কেটে, সরষের তেলে কালোজিরে ফোড়ন আর রসুন কুচি দিয়ে ঢিমে আঁচে নাড়াচাড়া করলে আব্বাসউদ্দিনের ভাটিয়ালির মতো একটি অপার্থিব পদের সৃষ্টি হয়। ধুলোশাক, কঙ্কাশাক, কলমিশাক, পাটশাক— সব লকলক করে এই বর্ষাকালেই। টাটকা কিনে এনে পাঁচফোড়ন, নুন, মিষ্টি দিয়ে এদের যে কোনও একটি নেড়ে নিলেই, দুপুরে ভাতের থালা পুরো রঙিন!

বর্ষায় বেশিরভাগ মাছই ডিমভরা হয়। কই, পারশে, ট্যাংরা, পুঁটি বা মাগুরের মতো

প্রথমেই বলেছি, বর্ষাকালে মন একটু গরগরে কষা-কষা খাবার খেতে চায়। এজন্যে থকথকে লালচে রঙা খাসির মাংসের কষা কিংবা তুলতুলে মেটের ঝালঝাল চচ্চড়ি, ঈষৎ বাদামি ছোপ তেকোনা পরোটার সঙ্গে স্বর্গীয়। এই পদগুলি রান্নার প্রি-কনডিশন হল, এটি খাওয়ার সময় মানুষের চোখ এবং নাককে বর্ষার ঝালের ছোঁয়ায় কিছুটা সজল হয়ে উঠতে হবে। আর কষা মাংসের সঙ্গে খিচুড়ি যে কী অনবদ্য— তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না!

সুতরাং এই বর্ষায় আকাশ জুড়ে শ্যামল মেঘের ঘনঘটা দেখুন, ঝিরঝির থেকে ঝমঝম— সব ধরনের বৃষ্টিকে হৃদয় দিয়ে উপভোগ করুন আর প্রাণভরে বর্ষার খাবার খান!

এই সময়টাকে কিছুতেই হাতছাড়া হয়ে যেতে দেবেন না!

বর্ষার দাগ

অনন্ত স্মৃতিভ্রংশে চিতা জ্বলে ওঠে

সুপ্রিয় মিত্র
mittirmoshai@gmail.com

বর্ষাকাল মানে বৃষ্টি হবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। তবুও কথায় কথায় আমরা বলি, '...এমন সময় বৃষ্টি নামল।' তারপর? তারপর শুনি— ঠায় সেইথেকে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা, বসে আছি তো বসেই আছি। সেই মুহূর্তের ছবি মনে করলে, মানুষটির আনমনা মুখশ্রী ভেসে ওঠে, তাকে হাসতে দেখা যায় না। তাকে উদ্বিগ্ন ভাবতে গেলে, জলের ভাপ এসে পড়ে, ফলে উদ্বিগ্ন হতেও দেখা যায় না। তার নিরুপায়তা তাকে তার মনের কাছে জড়ো করে আনে। রাস্তার গাড্ডার জলে সে নিজের প্রতিফলন মাপে। গাড়ির চাকায় সেই আয়নাবারি ভেঙে গেলে, পলক ভেঙে যায় এবং আবার কাঁপতে কাঁপতে জড়ো হতে থাকে। সে অজানা গানের শিস দেয়। সে বিস্মৃত লাইন গুনগুন করে। কাউকে একটা দরকার বলে মনে হয় তার। ফোন ঘাঁটতে থাকে, নম্বর খোঁজে। যাকে মনে পড়ে, তাকে নিয়ে কোনও একটি তিক্ত ঘটনার উদ্ভাসে তাকে বিরক্তিকর লাগে। যাকে মনে আসে, তাকে আরও আনতে চাপ লাগে কিংবা মনকে বলা হয় এটা অপ্রয়োজনীয়। সে তখন পোশাকের জল ঝরানোর চেষ্টা করে। কুঁচকে যাওয়া করতলের দিকে তাকায়। নিজের জল মাপে সে।

নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, বা যাঁরা কলেজে পড়াশোনা করেছেন, আজ থেকে ছ'-সাত বছর আগে, অখণ্ড পাগলাকে নিশ্চয়ই মনে পড়বে? খোনা গলা, ক্যাটওয়াক চলন, নেড়ামাথা, এক কানে দুল নেই, কিন্তু কানের ফুটো সোনালি সুতোয় জাগ্রত। মিশন গেটের অনতিদূরে একটা গলি, যে-গলি চলে গিয়েছে মিশন পল্লির দিকে, তার মুখেই ল্যাম্পপোস্টের নিচে অখণ্ড পাগলা থাকত। কেন তার নাম অখণ্ড, তার টুকরো বিশদও আমার কাছে নেই। মুখোমুখি হলেই, আর কাউকে নয়, আমার কাছেই এসে তাকে তার খিদের কথা জানাতে হত। মাঝে মাঝে মটকা গ্লরম হয়ে যেত, মাইরি বলছি! তা, আমি যা খেতাম, তা-ই ও খেত। কোনওদিন চাউমিন, কোনওদিন ডিমটোস্ট, কোনওদিন বাচ্চুদার ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন। তাকে দোকানদাররা ঢুকতে দিত না, আমাকেই খাবার পৌঁছে দিতে হত। বেদম হ্যাপা! কিন্তু এই খাওয়ার সূত্রেই কি না জানি না, অখণ্ড শুধু একবার, একবারই, এবং শেষবার আমাকে তার একটি কথা জানিয়েছিল, ক্ষুধা ব্যতীত।

ল্যাম্পপোস্টের গা ঘেঁষে একটি গজাল ঘাপটি মেরে মাটি থেকে মুখ উঁচিয়ে আছে। দেখে মনে হবে, গুল্ম ফুলের মতো ফুটেছে। বেশ মোটা। তাঁবু খাটানোর পেরেকমাফিক। অখণ্ড সেটা দেখিয়ে রীতিমতো বিজ্ঞের মতো বলল, যে-স্বরে খিদের কথাও বলতে শুনিনি,

—পিতিবির পায়ে এটা কবেথেকে ফুটে আছে, বুজলা! পিতিবির ব্যতা অয়! আমি দিকিচি। যকনই নাড়াই, উঠে না স্পালাটা, আর তারপোরই পিতিবি বেদ্‌নায় কাঁদতে লাগে, আর সালা বিসটি নামে!

—যখনই টানো তখনই বৃষ্টি নামে?

—হুঁ? নাআ্! আধ ঘণ্টা পর ফুঁপায় ফুঁপায় কাঁদে, বেসি টানবেক তো ঝমঝমাই দিবে!

এই বলে, প্রায় দশ-বারোটা আচমকা বৃষ্টির উদাহরণ দিল। দেখলাম, মিলছে তো! সেরেছে!

—কই দেখাও দেখি, কেমন বৃষ্টি নামে?

এই প্রশ্ন যখন অখণ্ডকে ছুড়ে দিচ্ছি, সেটা ২০১৩ সালের জুন মাস। সেয়ানা পাগল শুনেছেন? অখণ্ড বলল— টানব টানব, আগে ছাতা কিনে দাও!

পাগলের খেল্ দেখব, কিংবা জীবনে ফুর্তির ভালই অভাব ছিল। ছাতা কিনেও আনলাম।

তারপর, অখণ্ড বেদম টানল, ফাটিয়ে টানল, আশপাশ থেকে মাটির বমি বেরিয়ে এল অবধি, কিন্তু, গজাল বেরল না। অর্থাৎ গজাল বেরয় না, প্রমাণিত হইল। এবার অপেক্ষা। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে এক ঘণ্টা। কোনও পাত্তা নেই। কেবল পাতলা ঝোলে ঠান্ডা সরের মতো মেঘ ভাসছে আকাশে।

বিকেল পড়ে আসছিল। মিশনে ঢোকার সময়ও আসছিল এগিয়ে। শেষমেশ, ক্ষান্ত হয়ে লালচা-বিস্কুট খেয়ে যেই না গেট পেরিয়েছি, টিপিরটিপির শুরু হল, অচানক। সন্ধেবেলা খবর হল। কেদারনাথে গ্লেসিয়াল আউটবার্স্ট। রাত বাড়তে আকাশ রুদালি। হাউ হাউ স্থূল বৃষ্টি।

পরের দিন সাতসকালে অখণ্ডর কাছে ছুটে গেলাম। গজাল উপড়ে বেরিয়ে এসছে। প্রায় দেড় ফুটের দেহ তার, পড়ে আছে। নতুন ছাতা পড়ে আছে নেতিয়ে। ডাঁটি হাওয়া। আর, অখণ্ডও নেই। পাশে ইস্ত্রিদোকানি ঝাঁপ খুলতে খুলতে বললেন— বডি সকালেই নিয়ে গেছে পুলিস। কাল রাতেই বাজ পড়ে অখণ্ড ভোগাম্মা!

'আদিম' শব্দটি কানে বাজলেই সাধারণত খুব ভয়ংকর কিছু ভাবার, খুব তীব্র কিছু মনে করার একটা আয়োজন করে ফেলি আমরা মনের মধ্যে। কিন্তু, কেবল, আদিম বৃষ্টি বললেই একটা টানা ঝিরঝির আমার মাথার মধ্যে বাজতে থাকে। কোনও ঝমঝম নয়। মনে হয়, পৃথিবীকে মেঘ মহাবিশ্বের গল্প বলছে ওই। এবং বলছে মানে, তার শোনার শক্তিও রয়েছে। সে গল্পের কোনও টুইস্ট নেই। সেই গল্প কেবল গড়াতে থাকে। বিগ ব্যাং-এরও কোনও টুইস্ট নেই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রসব তার ঘটনামাত্র। বিজ্ঞানের আলো পাশে রেখে, বিষাদযোগ-এও যদি আমরা যাই, সেখানেও এই এক সুর। অনঙ্গ। অখণ্ড। বেহুঁশ। প্রবল জেনে ফেলার অবশতা, অসহ্যরকমের আমনা-সামনি হওয়ার ফলে ক্লেদ। তাই, রহস্যের ঘোর ও প্রসার। তাই, এই রহস্য থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম। তাই, বিষাদ। আর বর্ষাও। সেই তকমাপ্রাপ্তা।

শ্রাবণ আমার জন্মমাস। যেদিন জন্মেছিলাম, সেদিন নাকি ভয়ংকর বৃষ্টি হয়েছিল! মা বলে। ছোট থেকে এত এতবার শুনেছি যে, 'ভয়ংকর বৃষ্টি হয়েছিল' কথাটা বিশ্বাস করতে করতে শেষে বিশ্বাসটাও ভেঙে গিয়েছে। কেবল, ভ্যাপসা এক কৌতূহল কাজ করতে থাকে সবসময়। সেই বৃষ্টিকে খুঁজে চলি, এখন বুঝি। আর, সেই কৌতূহলের রথে ভর করে আমি

অখণ্ড পাগলার খণ্ডহীন
বিশ্বাসে যে-টান

মেরেছিলাম, তাই জন্য কেদারনাথে এই ম্যাসাকার? যতবার ভাবি, অস্বস্তি হয়। এ-ই কি কৌতূহলের প্রত্যুত্তরে বর্ষার দাগ? এ-ই কি বিষাদ? বিষাদ কি আসলে অলৌকিক কিছু?

বর্ষাতির উন্মোচন ঘটতেই, দেখা যায়, যা-হোক একটা জামা বা টপ গলিয়ে দেওয়া মানুষও বেশ রংচঙে একখান পোশাক পরে বেরিয়েছে। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'আরে, কী ব্যাপার, কালারফুল আজ?' সে বলবে, 'আরে জামাকাপড় শুকয়নি, আলমারি থেকে এই একটা খুঁজে পেলাম, পরে ফেললাম।' কিংবা সরাসরি বলবে, 'মুডটা কেমন মানডেন হয়ে ছিল, ভাবলাম একটু রঙিন কিছু পরি!' মনস্তত্ত্ব বলে, এই ভাসা-ভাসা জলঝরা অপসৃয়মান দিনে একটা স্পষ্ট রঙের নিশ্চয়তা দিয়ে মানুষ নিজেকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে। পোশাক ভিজে গেলে, তার গায়ের রং পোশাকের উপর উঠে আসে। আমার বাদামি গা। জামা ভিজে গেলে, জামার রং আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। যে মানুষ ফরসা, তার জামা হয়ে ওঠে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল, চঞ্চল। জল শোকাতে শোকাতেও কিছু একটা মনে পড়ে যায়, যা হয়তো পুরনো কোনও বৃষ্টি, বন্ধ্যা কোনও মেঘের। মনে পড়ার দরকার ছিল না, তবুও, কেন এল? প্রশ্ন জেগে উবেও যায়। জলের স্পর্শে তার শুকিয়ে যাওয়া অপমানের ঘা নরম হয়ে আসে। ফুঁড়ে ওঠে ঘুমন্ত অপরাধবোধের বীজ। অনন্ত স্মৃতিভ্রংশে দুরন্ত বৃষ্টিকে গিলে নেওয়া চিতা জ্বলে ওঠে, যেখানে বর্ষার দিনে বন্ধুরা শুয়ে আছে। সেই উত্তাপে আরও যেন ঠান্ডা লাগে। এবং সে আপ্রাণ নিজেকে ঢাকা দিতে শুরু করে। বিষাদের জন্ম সে টের পায়, এ প্রসব যে তারই, সেই বেদনা সে অনুভব করে। সম্মুখ সমরে, সামনের হুহু গতিশীল সময়ের সামনে ভেজা কাক হয়ে সে নিজেকে, তার কবচের ভিতরে অর্জুনের খেলাপিতে মাতে এবং নিরস্ত্র হয়। ভালনারেবল হয়ে ওঠে। অন্য জলে রুমাল ভিজে যায়। সে নিংড়োয়, আর মোছার চেষ্টা করে, নিংড়োয়, আর মুছে চলে। শোকায় এবং শোকাহত হয়। তারপর? 'সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি... বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে... গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে'?

হে বিষাদ, তখনই কি সেই প্রেমময়, পরমবন্ধুর আগমন?

কে জানে!

আমি মাকে ফোন করি তখন। বলি, এখানে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। ওখানেও হচ্ছে নাকি? মা কখনও বলে, হচ্ছে। কখনও, বলে, না তো। যদি বলে, হচ্ছে, তখন জিগাই,

—কীরকম? সেদিনের মতো?

শেষ পশলা: জন্ম নিজেই এক বিষাদ। বিষাদকে বিষাদবন্ধু দাও, তাকে একা ছেড়ো না। তার আবছাপনায় রংধনু ঢালো। গান আছে না, 'If you want the rainbow, you must have the rain!'